গল্প/গদ্য

অভিষেক ঝা

ইসবুটুপ

এমন নরম বিকালে নয়ানজুলির গন্ধ মেখে পাল কে পাল মেঘ বুনা হাতির মত ঝুরতে থাকে। অনেক চেষ্টা করে বোনা ক্ষেতি, বাড়ি, সংসারের উপর বুনা যা কিছু তাদের হুই রাগ সেই কবে থেকে! এখানে তো এখন শেষদুপুর রঙা ব্যাঙের গা এলানো আত্মসমর্পণের কথা ছিল সাঁঝ লাগতে শুরু করা গহুমার আধ-চিরা জিভে। ইসবুটুপ নামের হুরের বসে থাকার কথা ছিল এসব মেঘের জন্য; মেঘ আর ইসবুটুপের ভিতর এমনই কথা হয়েছিল। এসব কিছু না মিললে সব রাগ গিয়ে পড়ে গোছানো সবকিছুর উপর। প্রবল দাপাদাপির শেষে পোয়াটাক রোদ উঠেছে। ছড়িয়ে থাকা খেসারির ডাল, খুন্তির গায়ে লেপ্টে থাকা সাঁটি মাছের ভর্তা, মোচড়ানো তোরঙ্গ , ক্রমাগত পিছু ডেকে যাওয়া একমনে কোঁকাতে থাকা সংসার --- এই সবকিছু ফেলে সে বাদাড়ে ঢুকতে থাকে হামাগুড়ি দিয়ে। জল ঝরছে উপরের রোদ লেপ্টে থাকা পাতাগুলোর কিনার দিয়ে। আর একটু ভিতরে গেলেই শেয়ালের বিয়ের ঝুনুর শোনা যাবে। সে সময়ের রোদ চোখে ধরে নিয়ে আসতে পারলে আজব সব বাখোয়াজি হয়। রামধনুর কিনার খুঁজে পাওয়া যায়। তারা নাকে গেঁথে , কাকরঙা রেশম পরে পুরা গ্রাম জুড়ে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে আয়নায় সব মরে যাওয়া মানুষদের ছায়া নিয়ে কিসসা শুরু করে এক মেয়ে। মাজারের কোণের শিরিষ গাছটা থেকে কিসসা শুনতে নেমে আসে বকরঙা এক জিন। আর এই সবকিছু মিললেই সবকিছু ঠিক হয়ে যায় আবার। সে জানে।

"তিন আঁটি দশে দিবা কি?"

"আচ্ছা চার আঁটি পনেরোতে লিয়ে যান" ।

এসব সময় তাকে দেখতে বড় আজব লাগে। আশেপাশের লোকজন না বুঝতে পারলেও সে দিব্যি বুঝতে পারে তার চোখের ভিতরের ঝিল দেখতে পাচ্ছে না সামনের এই তিন আঁটি দশের দরদাম করা লোক। তাই রাজিও হচ্ছে না চার আঁটি পনেরোতে নিতে। অথচ একটু ঠাওর করলেই লোকটা দেখতে পেত তার রসুন কোয়ার মত সাদা চামড়ার নিচে উঁকি মারা নীল নদীগুলো ছাপিয়ে পুদিনা পাতার মতই শান্ত একটা সবুজ রঙের ঝিল জুড়ে আছে তার চোখ। মোম ফর্সা এক সবুজ চোখের মেয়ে বড় শান্তভাবে রেগে উঠছে দরাদরি করা লোকটার উপর। এই পাতা বুনতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তার বাড়ির পিছনে যেখানে শীত শুরুতে ফুলকপি আর শীত শেষে টমেটো বোনা হয় নিয়ম মেনে তার মাঝামাঝি এক ফালি মাটি রয়েছে। তার মাটি। এখানে সে ইচ্ছামতো বুনে। তার যা যা ভাল লাগে, যখন যেটা ভাল লাগে। লাল শাক, পালং,ছোলা, মটর, চকুই। কখনো হয়,আবার কখনো হয় না।কিন্তু ইচ্ছার চাষ এখানটা জুড়ে তার বরাবর। তাই এটা চষতে বেগও বেশি। তার ইচ্ছাকে তিন আঁটি দশে নামিয়ে আনা লোকটার এসব জানার কথা নয়।সে খুব ভালো করে জানে এই লোকটা তার দেশ চেনে না। তাকেও চেনে না। তাই এত সহজে নিচ্ছে তাকে। "লিয়ে জান, চারটা বারো"। ফেরার জন্য চট গুটায় সে।

ঘুম ভেঙে সে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে মশারির উপর কালচে টিনের চালের দিকে। এতটাই স্থির সে চোখ মনে হয় বুঝি জলের তলে মাছ বা গোরে শুয়ে নিজের শরীরের দিকে ঝুপ ঝপ করে মাটি পড়তে দেখা মড়া। এমন ভাবে চোখ খুলে সে মনে করছে তার ছোটোবেলায় শোনা গল্পগুলো। তার মা বলত তাকে। তার মা তার মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল। তার মা তার মায়ের কাছে। তার মা তার মায়ের কাছে। তার মা... সে অনেককাল আগের কথা। উদিকের ধানীজমিগুলান তখন বন আছিল। নমুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলকে দল আসে নাই তখনো। অসম থেকে খ্যাদা খায়ে তখনো ভঁইষের পালের মতন ভাগান দিতে দেরি আছে বহু। ছুঁড়ি রে ! দেশভাগ তো সেদিনের ব্যাপার! এই গল্প কত্তদিনের পুরানা জানিস! বনগুলান সাফা হয়ি যাবে – একথা তখনো ভাবতে পারে এমন গাছ একখানাও ছিল না। সেই সময়ে ভূত, দানো কোনো গজবের ব্যাপার ছিল না। ওই না-গজবীয়া দুনিয়াতে ফকসী ধরেছিল তার মায়ের মায়ের মায়ের মায়ের মাকে। হুই রাতে যে কেন বেরিয়েছিল মাগী সেটা গল্পে বলা ছিল না। বনের কিনার , নদী আর ক্ষেতির মাঝে তখন ছায়া খেলতেছে বাতাসে। হুইট করে ফ্যাকসিয়ে উঠে আগুন। দ্যাহে চারডে মেয়েছেলান আর ছ'ডা ব্যাটাছেলান ন্যাংটা হয়ে নাচতেছে। তার মায়ের মায়ের মা তার মায়েরে বলেছিল এরে ফকসী কয়। যে মাগীরা বাড়ি ছাড়ি , ভাতারের ইচ্ছামতো ভাতারেরে গুদ না দিয়া রাইতে বনবাদাড়ে যায় উয়ারা এর খপ্পরে আসে। আগুনের পাশে ফেলে তাদের গুদে লাঠি ঢোকানো হয়। তারপর ছুরি গরম করে কেটে নেওয়া হয় গুদের জিভবা। গুদের দাঁত নাই; তাই গুদ মুখের মত কামড়াইয়ে, চিল্লায়ে বাধা দিতে পারে না। তারপর? তারপর আর কী, মন দিয়া ক্ষেতি বাড়ি করে। বনবাদাড়ে যায় না। ভাতার যখন ভাত চায় ভাত দেয়, ভাতার যখন গুদ চায় গুদ দেয়। তা সেই মাগী তখন ভাবছিল এখন বাড়ি ফিরি ক্যামনে? বাড়ির চেয়ে বনকে কাছের ঠেকে তার; মনে হয় বনই তার বড়দাদি। বড়দাদির কোলে গেলে বেঁচে যাবে। পা দু'ডায় সরপট লাগায়। পা দু'ডা কখন যে মাটি ছেড়ে উঠে গেছে সে টেরও পায় নাই। আকাশে বুনা হাতির পালের মত মেঘ জমেছিল। বৃষ্টিতে ফকসীর আগুন নিভে যায়। ফকসীরা সব বাড়ি চলে যায় । বাড়ি ফিরে আসে সে বড়দাদির কাছ থেকে। অনেকদিন পর তার মেয়েকে সে এই গল্প শোনাবে। তার মেয়ে শোনাবে তার মেয়েকে। তার মেয়ে তার মেয়েকে। তার মেয়ে তার মেয়েকে। তার মেয়ে...

তার মেয়ে নেই। তার আছে জামির। সকালে জামিরের হাগার পর, গাঁড়ের চেরা জায়গার দু'পাশে লেগে থাকা মিহির হলুদ দানাদার আস্তরণকে তার একফালি জমিতে চাষ করা সর্ষার ক্ষেত মনে করতে থাকে সে। প্রথম প্রথম গন্ধে অসুবিধা হত। অন্যের শরীরের খইলের গন্ধ বড় বেশি করে পায় মানুষ। তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। এখন গন্ধটাকেও নিজের শরীরের গন্ধ মনে হয়। সে জানে নিজের শরীরে খইলের গন্ধ আছে যতদিন তার মেয়ে হতেও পারে। একটা মেয়ে হলে সে কী সুন্দর গল্পটা শুনিয়ে দিতে পারে। জামিরকেই নিজের মেয়ে ভেবে সে গল্প শুরু করে কোনো কোনো রাতে। খানিক গল্প এগাতেই জামির শুরু করে, "হাইল্লে এট্টু পা টিপে দে, পায়ে বড় ব্যথা"। জোনাকির মত জ্বলে ওঠে তার চোখ, জামির টেরই পায় না। দু এক সেকেণ্ড। জোনাকি নিভে যায়। বড় যত্নে সে জামিরের পা টিপতে শুরু করে। জামির গোঙাতে থাকে, "মাঈ গে মাঈ"।

"ইসবুটুপ বিবি, হাসব্যান্ড জামির প্রধান , বয়স ছত্রিশ, ১৭ নং খাসজমা", এক মাঝবয়সী সরকারি কর্মীর নির্লিপ্ত বলে যাওয়াকে বাধা দেয় সে, "ইসবুটুপ হুর"। "অই হল", আবার নির্লিপ্তি। সে বোঝে তার মাটিতে পায়ের পাতা না ছুঁইয়ে হেঁটে আসা দেখতে পায়নি এই অফিসের কেউ। সে খানিক হতাশ হয়। তারপর নিজেকে নিজের মা বানিয়ে বোঝায় যে এতে রাগ করতে নেই, দুঃখ পেতে নেই, বাড়ির কথা সে না ভাবলে চলবে? খানকির ছেলে জামির তো বিছানায় শুয়ে কোঁকানো আর হাত দিয়ে বাঁড়া ঝাঁকানো ছাড়া

শেখেনি কিছুই। শুধু অই একফাল জমিতে পুদিনা, পালং, লাল, চকুই বুনলে চলেক? তাই এরা তার মাটিতে না ছুঁয়ে চলা পা দেখতে না পেলেও এখানে বারবার আসতে হয় তাকে। শুনতে হয় তার জন্য সরকার কোনো টাকাপয়সা, ত্রিপল, টাটির বেড়া বরাদ্দ করেছে কিনা। একটা গুয়া হাতে ধরাতে হয় চেয়ারে বসা লোকজনকে। শুনতে হয় হরেক কথা। এবং প্রত্যেকবার তাকে বুঝতে হয় সে আসলে সে না, সে আসলে অনেকগুলান লোক। আর হেই লোকগুলানের জন্যই সরকারের দম বার হয়ি আসছে। সে অবাক হয়ে ভাবে তার কত দম যে সরকারের দম বার করি দিচ্ছে! তাই সরকার বাহাদুর ঠিক করিছে এই লোকগুলানের ভিতর যারা এখানকার লোক তাদের ছাড়া কারো দায়িত্ব লিবে না। এনার্ছি হইবেক।

সে যে অই জমির মালিক তা প্রমাণ করিতে তাকে এই নিয়ে সাতবার আইতে হল। প্রতিবার হাতে গুয়া ধরায় আর শোনে , “অই এক ডেসিম্যাল জমির পর্চা আছে? ওটা কি তোমার বাপের?”। সে উত্তর দেয় , “মায়ের”। “ এই তো হল মুশকিল। তা মা কি তার বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল জমিটা?”। সে উত্তর দেয়, “ মা তো পাইছিল তার মায়ের কাছ থেকে”। “ তোমার বাপের কোনো কাগজপত্র আছে? ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, বিপিএল?” । “ বাপ তো জন্মবার আগেই মরে গেছে”, সে খানিক শ্বাস নিয়ে বলে। এতক্ষণ পর পাশের টেবিল থেকে গোঁসাই চুপচাপ সব শুনছিল। গুয়াটা মুখ থেকে ফেলে ওই টেবিলের গোঁসাই এই টেবিলের দত্তকে বলে, “ শালা! এতদিন এই এলাকায় চাকরি করছো আর কিচ্ছুটি জানো না! ও নিজের নাম কী বলেছিল?” । “ ইসবুটুপ বিবি”, দত্ত গুয়া চিবাতে চিবাতে বলে। ইসবুটুপ বলে ওঠে, “ ইসবুটুপ হুর”। গোঁসাই-এর মুখে লুচ্চামি ঝিলিক দিচ্ছে। “দত্ত , বেশ্যার ইংরাজি কী?” । দত্ত’র চিবানো থামে, “ কল গার্ল? স্লাট?” । “আর?” গোঁসাই ভুরু নাচায়। “ হোর”, দত্তর চোখ জুড়ে জিজ্ঞাসা।

“দাও , একখান সিগারেট দাও তোমারে গল্প শুনাই”, দত্তের দিকে হাত বাড়ায় গোঁসাই। “এই অঞ্চলের নদী আর বনের মাঝের দোয়াবে বংশ পরম্পরার মুস্লা রেণ্ডিদের ‘হুর’ পদবি হয় হে”, দাঁতে আটকানো মাংসের ছিবড়া বার করে আরাম পায় এই অফিসের সবচেয়ে সিনিয়র ক্লার্ক। আরেকটা মাংসের টুকরো দাঁতে আটকে আছে; সেটা নিয়ে ব্যস্ত হতে হতে গোঁসাই বলে, “এরা ছিল সব ১৮৬৫ এর পর ইংরাজদের ফূর্তি। কাঁহাতক চা-বাগানের গোর্খা আর মদেশীয় ‘ছুকড়িদের’ নিয়ে খুশি হবে? তাছাড়া ‘ছুকড়ি’রা সবাই চা-বাগানে কোম্পানির বেতন পাওয়া বেশ্যা, তাদের ‘ব্লাডি হোর’ বললে নিজের বেতনটাকেও বেশ্যাবৃত্তি ঠেকে। তাই ইংরাজ বাবুদের জন্য চাটগাঁ থেকে ঔরঙজেবের আমলে ভেগে আসা মোছলমান রেণ্ডিদের রেডি রাখত চা-বাবুরা। তাদের ‘ব্লাডি মহামেডান হোর’ বলে করতে করতে সুখ নিত ইংরাজ। ব্যাস হোরেরা নিজেদের হুর ভেবে বসল গুদে ইংরাজদের বাড়া , জুতার বাড়ি, হিলহিলা চাবুক, থুতু, মুত সব নিতে নিতে”। মাংসের টুকরোটা দাঁত থেকে বেরিয়ে সোজা বাতাস কেটে ইসবুটুপের চোখের কোণে এসে আটকায়। “সেই পদবি নিয়ে এই শালিদের লজ্জা ছিল না , লোকলজ্জা পেল সরকার। এদের ‘হুর’ পদবি তুলে খাতুন, বেগম বানায়ে দিল। তা রেণ্ডির বেটির কাছে তুমি কিনা খুঁজছো বাপের ডকুমেন্ট!”, আর কোনো মাংসের টুকরো নাই দাঁতে, গোঁসাই আরাম বোধ করে। “ তাহলে একে কী জোগাড় করতে বলব, গোঁসাই’দা?”, দত্ত বিপন্ন হয়ে জিগায়। গোঁসাই সিগারেট ফুঁকতে বার হয় । সে গোঁসাইয়ের পিছন পিছন। আধা সিগারেট খেয়ে গোঁসাই বলে “ এই ইসবুটুপ! তুই যা। তোর কোনো চিন্তা নাই। ওই জমি তোর বাপের নামে করে দেব। শুধু কয়েকটা কথা শুনে রাখ। এখন বোরখা পরে, কলমা পরতে পরতে রেণ্ডিগিরি করিস। যদি কোনোদিন এখানে এন আর সি হয় আর এন আর সি’র পর মুস্লাদের তাড়ায়ে দিতে চাইলে শাঁখা-সিঁদুর পরা রেণ্ডি হয়ে যাস। মনে রাখবি , শাস্ত্রে আছে মাগীর কোনো জাত নাই। আমি বলছি মাগীর

ধর্ম নাই , দেশও নাই। চুদতে দিলে সব মাগীই আপন, আর চুদতে না দিলে... এই কথাটা ভালো করে মাথায় গেঁথে নে", গোঁসাই তাকে কদম তলায় একা রেখে অফিস ঘরে চলে যায়। সে গোঁসাইয়ের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব অবাক হয়ে কদম গাছটার দিকে তাকায় সে। নিচে কদম পড়ে আছে অনেক। থেঁতলে গেছে, কাদা মাখামাখি। নেশা লাগানো গন্ধ নাকে আসছে। তার অবাক হওয়া ধীরে ধীরে রাগে পরিণত হয়। প্রথম রাগ হয় মায়ের উপর। রাগ করতে গিয়ে মনে আসে মা মরে গেছে অনেক দিন। তারপর রাগ ছুটে যায় গুয়া চিবানো সরকারি লোকজনের উপর। ভয়ের চোটে রাগ আসে না তেমন এদের উপর। রাগটা থেকে যায় । তা নিয়েই বাতাস কেটে কেটে সে এগোতে থাকে শিরিষ গাছওয়ালা মাজারের দিকে। সে বোঝে তার পা এখন শূন্যে।

মাজারের ধারের কবরখানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দু-জন। প্রচুর মেঘ ভাসা এক বৃষ্টি হতে পারে হতে পারে এমন এক বিকাল। শীতের ভোরে সে অনেকদিন আগে এসেছিল এখানে।চুপটি করে তাকিয়েছিল সদ্য মাটি দেওয়া এক কবরের দিকে। একটু দূরে একটা হ্যালানো শিরিষ। চুপ করে সবকিছু দেখছিল সে। কাকরঙা বোরখার ফাঁক দিয়ে । তার মাকে কবরের ভিতর শুইয়ে দিচ্ছে নীল রঙের বোরখা পড়া অনেকগুলান মেয়ে। নীল রঙের বোরখা পরে বেরোলে তার মা অনেকদিন পর বাড়ি ফিরতো। সেই সকালেও বাড়ি ফিরে এসে সে দেখে তার মা লাল শাক লাগাচ্ছে। অনেক বছর আগে, পাশের দোগাছির জঙ্গলে নাকি চাঁদের রাতে হুররা নামত, এই গল্প করছে শাকেদের সাথে ।কবরে শুয়ে থাকতে থাকতে মানুষের কী কী ইচ্ছা হতে পারে মা'কে সেই বৃষ্টি হতে পারে বিকালে জিজ্ঞাসা করেছিল সে। ভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে মা বলেছিল, "আসমান দেখা" । " কবরের বাইরে যতদিন ছিল তখনও কি হেই একই আকাশ দেখে দেখে শখ মেটে নাই!! এখানে খালি ধূ- ধূ ক্ষেতি আর আকাশ, ব্যাস" । পিলসুজ রঙা একটা আলোয় ভরছিল চারপাশ। সে হাঁটছিল একটা জলার পাশ দিয়ে। খানিক পিছিয়ে তার মা, অনেকদিনে আগের শীতের ভোরে কবরে চলে যাওয়া মা। জলা থেকে বুড়বুড়ি কেটে উঠে আসছে কে যেন। দেখে তার মরে যাওয়া মা সেই জল থেকে উঠে আসা মেয়ে যে কিনা তারই বয়সী তাকে মা বলে ডাকছে। গোটা জলা জুড়ে বুড়বুড়ি কাটা শুরু হয়েছে। উঠে আসছে হরেক বয়সী মায়েরা, উঠে আসছে হরেক বয়সী মেয়েরা। হেলানো অশথের পাতারা মানুষের গলায় ফিসফিসাচ্ছে। তার মা, তার মায়ের মা, তার মায়ের মা সবাই জলের তলার গলায় তাকে ডাকছে, " ইসবুটুপ! ইসবুটুপ! তুই হুর..."

এইসব দুপুরে মাজারে কারো ঢোকা মানা। এখন বকরঙা জিন কিসসা শুনতে নামবে। বড় মসজিদের সেজলা মৌলভী সেই জিন নামায় এইসব দুপুরে এই মাজারে। সেই জিনের হাওয়া লাগলে বংশ লোপাট হয়। তাই কেউ এখানে আসে না এইসময়। এসব লাল ঠাণ্ডা মেঝে আর সাদা গম্বুজের সংসারে লালাভ দুপুর এক জানলা বন্ধ অথচ পরতের পর পরত খুলতে থাকা ঘরের ভেতর সব ভিতর-ঘর নিয়ে আসে । মাজারের ঘুলঘুলি দিয়ে যেটুকু সামাজিক আলো আসার বাধ্যতা রয়ে যায় সেখানে সামাজিকতার চলাফেরা অনেকক্ষণ পরপর উল্টোনো মানুষের ছায়ার মত লাগে । সে জানে খুব বেশি হলে একটা কুকুর জিভ বের করে জানলার বাইরে দুপুর জুড়ে লালা ঝরাচ্ছে শুধু । সে ভয় পেতে থাকে কখন মৌলভীর খিল দেওয়া দরজায় টোকা দিয়ে এই বুঝি কেউ ঢুকে পড়বে! বুড়া মৌলভীকে যদি জিনে পায় এখনই তাহলে কী হবে! জামির যদি ওল্লাউল্লি করে পাশের বাড়ির রুখসানাকে তার খোঁজে পাঠায় আবার! "আল্লাহ!", সেজলা মৌলভী থামে। জিন চলে গেছে গল্প শুনে। সব মিটে গেলে প্রতিবারের মত হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেয় সেজলা মৌলভী। ভালো লাগায় ভরে উঠে ইসবুটুপের মন।

জামির ঘুমাচ্ছে। খেসারির ডাল নামিয়ে সাঁটির ভর্তা রসুন দিয়ে মাখছে সে। এই শেষ দুপুরে কালো করে আসছে চারদিক। হাতিয়ার বৃষ্টি নামবে এখনই। হাওয়া দিচ্ছে খুব। ঘোলা চোখ মেলে তাকাচ্ছে জামির। ঘোলা গলায় বলছে, "মাংসের জোগাড় হইবেক না আইজ? মাস তো পেরুতে চলল। মাজারে যাবা না? এনার্ছি বাবুরা কোন কগজ নিয়া যেতে বললো?"। রাগটা ফিরে আসে। গোঁসাইয়ের উপর রাগ। জামিরের উপর রাগ। যেন সবাই সবকিছু জেনে গেছে। সে চোখ রাখে জামিরের চোখে।

তার মেয়ের মেয়ের মেয়ের মেয়ে দেখতেছে ছ'ডা মেয়েছেলান আর চাইরডা ব্যাটাছেলান অই একফালি জমিটায় আগুন জ্বালায়ে নাচতেছে। গুদের জিভভা কেটে নেওয়ার লগে আঙটা গরম হইতেসে। বোঝে ফকসীর পাল্লায় পইড়ছে সে। তারে বাঁচতে হলে ভাগতে হবে। বন অনেক কাছের ঠেকে তার , মনে হয় বড়দাদির কোল। বাড়িকে মনে হয় অনেক দূরের । নিপুন বাতাস কেটে উড়ে যায় ইসবুটুপ হুর । হাতে হাঁসুয়া। হাঁসুয়ার কোপ নেমে আসছে জামিরের গলায়। ফিনকি মেরে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এতদিনের নড়াতে না পারা শরীরটা নিয়ে কী তীব্র ভাবে ছটপট করছে জামির!

সে জানে এই মেঘে শিয়ালি বৃষ্টি হবে। ছটপটাতে থাকা সবকিছু নিশ্চল হবে খানিক পর। তখন বাদাড়ে ঢুকতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে। বাদাড়ে খানিক দূর এগোলে শেয়ালের বিয়ের ঝুনুর শোনা যাবে। সে সময়ের রোদ চোখে ধরে নিয়ে আসবে সে। আজব সব বাখোয়াজি হবে। রামধনুর কিনার খুঁজে পাবে । তারা নাকে গেঁথে কাকরঙা রেশম পরে পুরা গ্রাম জুড়ে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে আয়নায় মরে যাওয়া মানুষদের ছায়া নিয়ে কিসসা শুরু করবে সে। মাজারের কোণের শিরিষ গাছটা থেকে কিসসা শুনতে নেমে আসবে বকরঙা এক জিন। আর এই সবকিছু মিললেই সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে।

Copyright © 2019 Abhihek Jha Published 1st Nov, 2019

অভিষেক ঝা বাংলা ভাষায় গদ্য লিখছেন ২০১১ থেকে। এখন অবধি প্রকাশিত গদ্যের বই " হোঃ" । মৌলিক গদ্যের পাশাপাশি অনুবাদ ও সম্পাদনাও করে থাকেন। সহ-সম্পাদনা করেছেন " কাশঃ কাশ্মীরি পণ্ডিত ও কাশ্মীরি মুসলমানদের সাম্প্রতিকতম ছোটোগল্পের অনুসৃজন" এবং সম্পাদনা করেছেন " ত্রস্তের শিকড়বাকড়ঃ নির্বাচিত মিঞা কবিতা"।